যৌবনের নবদ্বোধন-মন্ত্র : ফাল্গুনী

‘নতুন করে পাব বলেই’

শাওন নন্দী

এক

আধুনিক মনস্তত্ত্বের একটি স্বীকৃত সমস্যা—মধ্যজীবনের সংকট (Mid-life Crisis)। বর্তমানে গড় আয়ু বেড়ে চলা মানুষের জীবনে সমস্যাটি বহুমাত্রিক। এই সর্বগ্রাসী ভোগের জমানায় মধ্যজীবন পার করা পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই মন, ফুরিয়ে আসা যৌবনের হাহাকারকে ভুলে থাকতে নিত্যনতুন কত-না পথের অনুসন্ধান করে চলেছে! সে সেব পথ ভোগেরই নানাবর্ণ হাতছানির পথ। প্রাচীন ভারতবর্ষ একসময় যে বয়সকে আধ্যাত্মিক মননে আত্ম-নিবেদনের বয়স বলে মনে করতো, আধুনিক পাশ্চাত্য-গন্ধী সভ্যতায় সেই বয়সই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোগবিলাসী যাপনে আত্মনিমজ্জনের উপযুক্ত সময়। কিন্তু এই নিবেদন ও নিমজ্জনের বাইরে, আরো একটি তৃতীয় পরিসর ছিল—উজ্জীবনের। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে যৌবনের ফেলে আসা সুবর্ণকান্তির জন্য হাহাকার নয়, বরং নব-রূপে যৌবনের নবোদ্বোধনে এই বয়সকে মান্যতা দেওয়ার। অনেকদিন আগে, যথাযথভাবে বলতে গেলে আজ থেকে একশো বছর আগে, সেই ১৯১৬-তে রবীন্দ্রনাথ তেমনই এক ঠিকানার সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন আমাদের; দিতে চেয়েছিলেন নিজেকেও—‘ফাল্গুনী’ নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে।

দুই

‘ফাল্গুনী’ গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (ফাল্গুন ১৩২২)। এর আগে ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্রের ‘সবুজপত্র’-এ মূল নাটকটি মুদ্রিত হয়। সেখানে ‘গীতিভূমিকা’গুলি এবং সর্বশেষ গানটি নাট্যবিষয়ের প্রবেশকরূপে ‘বসন্তপালা’ নাম দিয়ে একত্রে গ্রথিত ছিল; এবং অবশিষ্ট অংশটির নাম ছিল ‘ফাল্গুনী’। এরপর ‘সবুজপত্র’-এর ১৩২২ মাঘ-সংখ্যায় এর ‘সূচনা’ অংশ ‘বৈরাগ্যসাধন’ শিরোনামে মুদ্রিত হয়। পূর্বোক্ত ‘বসন্তপালা’ এবং ‘ফাল্গুনী’-র দুটি স্বতন্ত্র ভূমিকা ছিল, নাট্যভাবনার প্রেক্ষিত ও নাট্যকারের অভিপ্রায়টুকু যার থেকে অনায়াসেই চিনে নেওয়া যায়।[১]

কিন্তু সেই ভূমিকার প্রসঙ্গে আসার আগে, এই নাটকটির প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রজীবনের ভূমিকাটির প্রতি একটু নজর দেওয়া যাক। যে দশকে এই নাটকটি লেখা, তার ঠিক আগের দশকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে মৃত্যু-ঝড়ের তাণ্ডব। মাত্র ৪১ বছর বয়সে কবি তাঁর ২৯ বছর বয়সী স্ত্রী মৃণালিনীকে হারিয়েছেন (১৯০২); পরের বছর

হারিয়েছেন কন্যা রেণুকাকে (১৯০৩), বয়স তার তখন মাত্র ১২ বছর; ১৯০৭ সালে কবির প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে অকালে, মাত্র ১১ বছর বয়সে। এরই মধ্যে ১৯০৫-এ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ। একের পর এক মৃত্যুর মারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে কবিমন; বিচলিত হয়েছে বারবার। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ বলেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাননি। ঝড় আর রাত্রিকে সম্বল করেই তিনি পথে নেমেছেন। সে পথ অধ্যাত্ম-চেতনার পথ। সে পথ আত্মদীপে নিজেকে উদ্বোধিত করার পথ। সে পথ 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'-র স্থৈর্য সহন ও নিবেদনের পথ।

কিন্তু আত্মার শান্তি কি সেখানেও পূর্ণরূপে পাওয়া হল? পাওয়া সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মতো জীবন-সাধকের? কর্মই যাঁর ধর্ম, তাঁকে এই মধ্যজীবনের দুঃখভার কি শুধুই আত্মনিবেদনের এই সম্বৃত-যাপনে ঢেকে ফেলতে পারে? দুঃখের মার আর নৈরাশ্যের ভার নিয়েই তাই তাঁর পথ চলা কোথাও থেমে যায়নি। শান্তিনিকেতনের বহুমুখী প্রকল্প রূপায়ন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, গোরার মতোই স্বয়ং তার স্রষ্টারও ভারতাত্মার অন্বেষণ, আর নিজের সৃজনশীল সত্তাকে হাজারো ঝড়ের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা, উজিয়ে রাখার চেষ্টা—অন্ধকারের বিরুদ্ধে এভাবেই নিজের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই আলো-অন্ধকারের টানাপোড়েনের মধ্যেই, প্রৌঢ়ত্বের দোর-গোড়ায়, মধ্যজীবনের সংকট নামে মনের অসুখটি এক সময় পেয়ে বসলো তাঁকেও। আর পাঁচজনের মতো হয়তো নয়, কিছুটা অন্যরকম ভাবে—কর্মযজ্ঞের এত ব্যস্ততা, তবু, এতটা পথ চলে এসে 'কিছুই তো হল না'—এই বোধ ক্রমশ গ্রাস করে নিতে থাকলো তাঁর কর্মোদ্যোগ ও মানসিক স্ফূর্তিকে!

"এই আত্মিক ব্যাধিটা কি? প্রত্যেক মানুষের জীবনে, বিশেষ যাঁহারা কল্পনাপ্রবণ আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ, তাঁহাদের জীবনে প্রৌঢ় বয়সে এমন একটা অস্বাভাবিকতার সময় আসিয়া থাকে। তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, 'এতকাল নদীকূলে, যাহা লয়ে ছিনু ভুলে'—সমস্তই যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু ঐরূপই তাঁহাদের ধারণা হইয়া থাকে। ইহাকে প্রৌঢ় বয়সের গোধূলি সময়ের অনিশ্চয়তা বলা যায়। মনীষী ব্যক্তিরা সাধনবেগে এই সময়টাকে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন স্বস্তি, নূতন শান্তি এবং নবতর ভাবসাম্যের ক্ষেত্রে উপনীত হন। রবীন্দ্রনাথও হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে সেই নূতন ক্ষেত্র বলাকা ও ফাল্গুনী। দুইটি রচনাই সমসাময়িক।

এই ব্যাধির পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার দেহগত যৌবন তো অপনীত হইল—কিন্তু তাহার পরিবর্তে নূতন কোনো স্বাদ, মহত্তর কোনো ইঙ্গিত তো জীবনে উপনীত হইল না।... দেহের যৌবন চলিয়া যাওয়াই তো ধর্ম, তাহাকে রাখিতে গেলেও থাকিবে না। তখন এই অবস্থায় দেহের যৌবনের বিকল্প অনুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত হইলেন। যতদিন এই বিকল্পের সন্ধান তিনি পান নাই, ততদিন তাঁহার মন সুস্থ হয় নাই, ততদিন তাঁহার জীবনে অশান্তি ও অস্বাভাবিকতা ছিল। ইহাই তাঁহার ব্যাধি। ডাকঘরে এই ব্যাধির পরিচয়। বলাকা ও ফাল্গুনীতে তাঁহার ব্যাধিমুক্তি,.... বলাকা ও ফাল্গুনী বিকল্প যৌবন বা প্রৌঢ়ের যৌবনের কাব্য।... এই দু'খানি বই নিরাসক্ত যৌবনের আনন্দলোকের কাব্য।"[২]

১৯১০-এ প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' একদিক থেকে রবীন্দ্র-অধ্যাত্মচেতনার বিকাশের তুঙ্গ মুহূর্ত। এই প্রবাহ আরো তিন-চার বছর তাঁর মন ও কলমকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার মধ্যেও তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন ওই আত্মিক ব্যাধির উপশম। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হল 'ডাকঘর'। ব্যাধি-পীড়িত আত্মার মুক্তির আর্তি বালক-অমলের রূপকে ধরা দিল কবির কলমে। কিন্তু, ব্যাধিমুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া গেল আরও কিছুদিন পরে। তারই মধ্যে ঘটে গেছে বেশ কয়েকটি ঘটনাও। ১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ও সেই সূত্রে দেশবাসীর কাছে কবির গড়ে ওঠা এক ভিন্নতর গ্রহণযোগ্যতা (যা রবীন্দ্রনাথ নিজেই অবশ্য ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি)। ইউরোপ ভ্রমণকালে তাঁর দার্শনিক মননে ধরা পড়া সেখানকার অস্থিরতা, যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ১৯১৪-র প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদনশীল ও মানবতার চির-পূজারী ব্যক্তিত্বের কাছে, সময়ের হাত ধরে উঠে আসা উজ্জীবনের নতুন চ্যালেঞ্জ! ....ওই ১৯১৪ সালেই প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র'-এর প্রকাশ। 'সবুজের অভিযান'-এ খোলা-কলমের আহ্বান, কোথাও রবীন্দ্রনাথের নিজেকেও নব-সবুজায়নের ডাক দেওয়া। এই সময় থেকেই কবিতা ও গদ্যে রবীন্দ্রনাথের সচেতন বাঁক-বদলের ইশারা। ১৯১৬ সাল, যে বছর চারটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশ—'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস; কাব্য— 'বলাকা' এবং নাটক 'ফাল্গুনী'।

ভোগাকাঙ্ক্ষা আর আসক্তি নিয়ে যে যৌবনের এত মাতামাতি, এই সময় থেকে তার বাইরে নব-উজ্জীবিত যৌবনগাথা রচনার বহুবর্ণ বিভাময় প্রয়াস। 'ফাল্গুনী' নাটকের কবিশেখরের ভাষায়—'প্রৌঢ়দের যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।' এই ফলতে চাওয়া নব-যৌবন নিরাসক্ত কর্মনিষ্ঠতায় নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চায়। প্রেমও সেখানে আসে এই নবাবিষ্কৃত যৌবনের প্রেরণা হিসেবে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পরবর্তী-জীবনে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মতো বন্ধুকে পান; প্রেম যেখানে নবোদ্বোধিত কর্মযজ্ঞের প্রেরণা হয়ে উঠেছে! ...'ফাল্গুনী'—তাই হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের ওই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধিমুক্তির বার্তাবাহী। এই নাটকের ব্যাধিপীড়িত রাজাও তিনি, ব্যাধিমুক্তির দূত কবিশেখর-ও (counsellor) তিনি-ই স্বয়ং! ...আর বাকি যারা রূপকাশ্রয়ী চরিত্র—সেই সর্দার, দাদা, অন্ধ বাউল কিংবা চন্দ্রহাস—তারাও রবীন্দ্র-ভাবনারই একেকটি বিচ্ছুরিত দিক। পূর্বকথিত 'বসন্তপালা' ও 'ফাল্গুনী'-র ভূমিকা দুটি যে অভিপ্রায় ও রূপকায়িত চরিত্রগুলির প্রাথমিক পরিচয়টুকু, আমাদের সামনে অল্প কথায় সাজিয়ে রেখেছে।

তিন

'বসন্তপালা'-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক ফাল্গুনী বলিয়া একটি নাটকের ধরনের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই বসন্তের পালার গানগুলি

তম্বুরার মতো তাহারই মূল সুরকয়টি ধরাইয়া দিতেছে। অতএব এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়াল-নাটকের চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে। পাণ্ডুলিপি অনুসারে 'ফাল্গুনী' রচনার স্থান সুরুল; এবং তারিখ ২০ ফাল্গুন ১৩২১ বঙ্গাব্দ। পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত 'গীতিভূমিকা'র অন্তর্গত গানগুলির রচনাকালানুসারী একটি তালিকা নির্মাণ করলে, তা দাঁড়ায় এমন—'ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া' (১২ ফাল্গুন রাত্রি ১৩২১), 'ছাড় গো তোরা ছাড় গো' (ঐ), 'আমরা নূতন প্রাণের চর' (১৩ ফাল্গুন প্রভাত ১৩২১), 'আমরা খুঁজি খেলার সাথি' (১৩ ফাল্গুন, ১৩২১), 'ওর ভাব দেখে যে হাসি পায়' (ঐ), 'এই কথাটাই ছিলেম ভুলে' (ঐ), 'আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে' (ঐ), 'এবার তো যৌবনের কাছে' (ঐ), 'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম' (১৩ ফাল্গুন, রাত্রি ১৩২১), 'আকাশ আমার ভরল আলোয়' (ঐ), 'আর নাই যে দেরি' (১৪ ফাল্গুন, প্রভাত ১৩২১), 'এতদিন যে বসেছিলেম' (১৫ ফাল্গুন রাত্রি ১৩২১), 'তোমায় নতুন করেই পাব বলে' (২০ ফাল্গুন রাত্রি ১৩২১), 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম' (২১ ফাল্গুন প্রাতে ১৩২১), 'ওগো নদী, আপন বেগে' (২৩ ফাল্গুন ১৩২১), 'চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে' (ঐ)।...[৩]

এই ১৬টি গান theme-এর দিক থেকে কোথাও একই মাল্যের নানা কুসুম। বোঝা যায়, ২০ ফাল্গুন লেখা নাটকটির ভাবনা, নাট্যকারের মনে আবর্তিত হচ্ছিল বেশ ক'দিন ধরে। এর মধ্যে শেষ তিনটি গান তারিখের দিক থেকে নাটকটি রচনার পরে লেখা হয়েছে; যা পরবর্তীকালে নাটকেরই অপরিহার্য অংশরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, এর মধ্যে এমনও দিন গেছে (১৩ ফাল্গুন ১৩২১), সেদিন ১৬টির মধ্যে ৮টি গান সকাল থেকে রাত্রির পরিসরে রচনা করেছেন কবি।

২৩ ফাল্গুনের গান দুটি ছাড়া, আর সব ক'টি গানই সুরুলে রচিত। শুধু এই দু'টি গান রচিত হয়েছে রেলপথে। আর নিছক কাকতালীয় নয় বোধহয়, সেই কারণেই, এই গান দু'টির মধ্যে নিহিত চলমানতার বার্তা। আসলে এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ ওই পূর্বকথিত স্থবিরতার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। জঙ্গমতাকে আপন করে নিতে চাইছিল, তাঁর এই নব-দিশারী যৌবন! 'বলাকা'-কাব্যেও একদিকে বের্গসঁ-র গতিতত্ত্ব আর অন্যদিকে উপনিষদের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর 'চরৈবতি'র চলিষ্ণুতার মন্ত্র এসে মিলেছিল, —প্রাণের সজীবতাকে এই চির সচলতার মধ্যে খুঁজে নিতে চাইছিলেন কবি। 'ফাল্গুনী' নাটকের গভীরে এসে জুটেছিল সেই এক-ই ডাক। প্রাণের জীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে নব-উজ্জীবনের আহ্বান। 'বলাকা'-র বিভিন্ন কবিতায় সেই অভিপ্রায়ে ঘোষিত হয়েছে মৃত্যুত্তীর্ণ প্রাণের বিজয়-বারতা। প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান'-এ সে খবর এসেছে একভাবে—('চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,/জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে/প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি'); একভাবে এসেছে তৃতীয় কবিতায় ('আমরা চলি সমুখ-পানে/কে আমাদের বাঁধবে'); আবার তারই ভিন্নতর রূপ ফুটে উঠেছে 'ছবি' (৬ সংখ্যক) কবিতার মৃত্যুঞ্জয়ী বার্তায় ('সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী/মরণের বাজায়ে কিঙ্কিনী')।

শুকিয়ে যাওয়া জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রাণের শক্তিকে এই গতিজাড্যের মধ্যেই

খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই কাব্যের 'চঞ্চলা' (৮ সংখ্যক) কবিতায় যে স্পর্ধা ও প্রত্যয়ে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—'হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,/চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী,/শব্দহীন সুর।/অন্তহীন দূর/তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া?/সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘর ছাড়া।' ...এই পথের প্রেম, 'ফাল্গুনী'তে এসে নবরূপ নিয়েছে প্রেমের পথে; চন্দ্রহাস হয়ে উঠেছে সে প্রেমের দ্যোতক! ...সেই প্রেম খুঁজে পেয়েছে চির-যৌবনের এক মহোজ্জ্বল ঠিকানা। যে বিশ্বাসে 'বলাকা'-র ১৩ সংখ্যক কবিতা ঘোষণা করেছে—'যৌবন আমার/চিরদিনকার'। ...যে বিশ্বাসে ভর করে এই আশ্বাসবাণী ভরে দিতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কবিতায়—'যৌবন রে, তুই কি কাঙাল আয়ুর ভিখারী?/মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে/তুই যে শিকারি।/মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে/অমৃতরস নিত্য তোমার তরে'; ('বলাকা'—৪৪ সংখ্যক কবিতা) কিংবা বলতে পেরেছেন—'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ পুরাতন রাত্রি/ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী!' ('বলাকা'-৪৫ সংখ্যক কবিতা) বসন্ত, বছরের শেষ ঋতু। শীতের ঝরা পাতার কিশলয়ে ফিরে আসার বেলা। পুরোনো বছরের জীর্ণতাকে ঝরিয়ে দিয়ে, নতুন ঊষাকে স্বাগত জানাবার মাহেন্দ্রক্ষণ। আর ফাল্গুন, সেই ঋতুরই সূচনাগাথা। তার চলা যে 'যায় না বলা', তার যে 'আলোর পানে প্রাণের চলা' ....নিরুদ্দেশ, তবু প্রাণস্পর্ধায় ভরপুর। যে নেশায় এই মহাবিশ্বলোকও মাতোয়ারা—"ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—/'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!' ('বলাকা'—৩৬ সংখ্যক কবিতা) ...এই স্পর্ধিত প্রাণাবেগের বিজয় পতাকা ধারণ করে আছে 'ফাল্গুনী'-র গানও। গানগুলিতে শুধু এই প্রাণচঞ্চল গতির সঙ্গে এসে মিশেছে যৌবন-চেতনা। চলায় লেগেছে নবোদ্বোধিত প্রাণের আস্বাদ। বেজে উঠেছে উজ্জীবনের গান, বহুমাত্রায় বহু স্বরে!

সেখানে আমরা দেখেছি অন্ধ বাউল কীভাবে পথ দেখায়, বেঁচে থাকার মর্ম-পথটি চেনায় তার গানে। সে শোনায়—'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার/জয়ের মালা।/বইল প্রাণে দখিন হাওয়া/ আগুন জ্বালা।/ ...যৌবনেরই ঝড় উঠেছে/আকাশ-পাতালে।/নাচের তালে ঝংকারে তার/আমায় মাতালে।' ....অন্ধকারে দিশেহারা নবীনের দল, তার গান থেকেই সে ভরসা কুড়িয়ে নেয়। চিনে নিতে পারে সঠিক দিশা! যখন বাইরের আলো ফুরিয়ে যায়, তখন অন্তরের আলোয় পথ দেখা বাউলের মনই এমন গানের আশ্রয় আমাদের দিতে পারে, বলতে পারে—'এ আঁধার হবে ক্ষয়'...! তার গানের আশ্বাস বেয়ে আমরা বুঝতে পারি, নতুন করে বারবার ফিরে পাওয়া যায় বলেই, যৌবন নিয়ে হারানোর ভয় পেতে নেই। হয়তো পুরোনো চেহারায় নয়, কিন্তু নবরূপে যৌবন ফিরে আসে। শুধু তাকে চিনে নেবার মতো মনটুকু থাকা চাই, দৃষ্টি থাকা চাই। গুহার ভিতরে লুকিয়ে থাকা সেই সর্বনাশা জরাবৃদ্ধই যে সর্দার—সেটা চিনতে পারা চাই। একবার চিনতে পারলে অনায়াসেই গেয়ে ওঠা যায় এই গান—'অকূল প্রাণের সাগরতীরে/ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে।/ যা আছে রে সব নিয়ে তোর/ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে/আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।' এই 'ভালোবাসার ধন'কে 'নতুন করে পাব বলে'ই ক্ষণে ক্ষণে হারানো যায়—'ফাল্গুনী' আমাদের সেই

বিশ্বাসে ভরে দেবার নাটক।

এই নাটকে চারটি দৃশ্যের 'গীতিভূমিকা'-য় ধরে দেওয়া আছে এই বার্তা, নাটকের এই মর্জি। পূর্বোক্ত ১৬টি গান এবং প্রতি দৃশ্যের অন্তর্গত গানগুলি এইভাবে সজ্জিত—প্রথম দৃশ্যের গীতিভূমিকা, যার সূচক শীর্ষনাম—'নবীনের আবির্ভাব'। প্রতিটি গানের শীর্ষে উপশিরোনামের মতো সূচিত হয়েছে গানটি কার বা কাদের, সেই কথা। এই দৃশ্যে রয়েছে 'বেণুবনের গান'— 'ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া'; 'পাখির নীড়ের গান'—'আকাশ আমায় ভরল আলোয়'; 'ফুলন্ত গাছের গান'—'ওগো নদী আপন বেগে পাগল-পারা। এরপর প্রথম দৃশ্যের অন্তর্গত গানগুলি—যুবকদলের প্রবেশ ও গান—'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে', 'আমাদের পাকবে না চুল গো', 'আমাদের ভয় কাহারে'। দ্বিতীয় দৃশ্যের 'গীতিভূমিকা'-র সূচক-শিরোনামে—'প্রবীণের দ্বিধা'। এর অন্তর্গত গান ৪টি; যথাক্রমে—'দুরন্ত প্রাণের গান'—'আমরা খুঁজি খেলার সাথি'; 'শীতের বিদায়-গান'—'ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো'; 'নবযৌবনের গান'—'আমরা নূতন প্রাণের চর' এবং 'উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান'—'ছাড়্ গো আমায় ছাড়্ গো'। এই দৃশ্যের অন্তর্গত গান— 'আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে', 'চলি গো চলি গো যাই গো চলে', 'ভালোমানুষ নই রে মোরা'। তৃতীয় দৃশ্যের 'গীতিভূমিকা'য় সূচক-শীর্ষনাম 'প্রবীণের পরাভব', যার 'গীতিভূমিকা'-য় রয়েছে দুটি গান—'বসন্তের হাসির গান'—'ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি' এবং 'আসন্ন মিলনের গান'—'আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি'। এ-দৃশ্যে ব্যবহৃত গানগুলি হল—'মোরা চলব না।/মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না'; 'ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে/চলো তোমার বিজন মন্দিরে'। এবং শেষ তথা চতুর্থ দৃশ্যের 'গীতিভূমিকা', যেখানে গানের সংখ্যা ৪টি; তার সূচক- শীর্ষনাম 'নবীনের জয়'। এর অন্তর্গত গানগুলি হল—'প্রত্যাগত যৌবনের গান'—'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে'; 'নূতন আশার গান'— 'এই কথাটাই ছিলেম ভুলে'; 'বোঝাপড়ার গান'— 'এবার তো যৌবনের কাছে/ মেনেছ হার মেনেছ?'; এবং নবীন রূপের গান'— 'এতদিন যে বসেছিলেম/পথ চেয়ে আর কাল গুণে/দেখা পেলেম ফাল্গুনে।' ...এই দৃশ্যের অন্তর্গত গানগুলি হল—'তুই ফেলে এসেছিস কারে।/মন, মনরে আমার!'; 'আমি যাব না গো অমনি চলে।/মালা তোমার দেব গলে'; 'সবাই যারে সব দিতেছে/তার কাছে সব দিয়ে ফেলি'; 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার/জয়ের মালা'; 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'; 'হবে জয়, হবে জয়'; 'তোমায় নতুন করেই পাব বলে'; এবং 'আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে'। ...একটি ছোটো নাটকে এতগুলি গানের প্রয়োগ, এই অপেরা-ধর্মী চলন—নাটকের গঠন-কৌশলের দিক থেকে কতদূর সমীচীন—প্রথাগত ভাবনায় এই চিন্তা উঠে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যদি মেনে নিই, প্রথাগত নাট্যধারার বাইরে এ-এক অন্যরকম প্রচেষ্টা, যদি মনে রেখে দিই এ এক 'খেয়াল-নাটক', তবে এই নাটকের মর্মের বাণী যে গানগুলির মধ্যেই নিহিত আছে—তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। 'গীতিভূমিকা'-র অভিনব প্রয়োগের সূত্রে নাট্য-বক্তব্যের বিবর্তনরেখাটি একদিকে যেমন ধরা পড়ে, তেমনই অন্যদিকে দৃশ্যের

অভ্যন্তরে প্রযুক্ত গানগুলিও যে প্রধানত নব-যৌবনবার্তার নিখাদ বাহক হয়ে উঠতে পেরেছে—সে বিষয়টিও আমরা অসংশয়ে মেনে নিতে পারি।

চার

এবারে আসা যেতে পারে পূর্বকথিত 'ফাল্গুনী'-র ভূমিকার কথায়। এই কথা-প্রসঙ্গেই আমাদের এ আলোচনা পৌঁছে যাবে সমাপ্তির দুয়ারে। তবে তার আগে নাট্যকাহিনিটি অল্প কথায় বলে নেওয়া যাক। গল্পের বিষয় যতই গভীর হোক, এ-নাটকের গল্পের আয়োজন সামান্যই। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজার ভারী মন-খারাপ। রাজমহিষী তাঁর কানের ওপর দুটি পাকাচুল আবিষ্কার করায়, রাজার মনে হয়েছে—তাঁর যৌবন বিগত। অতঃপর মৃত্যুর ডঙ্কা বেজে উঠলো বলে! তাই রাজা হারিয়ে ফেলেছেন কর্মোদ্যোম। বৈদেশিক দূতের আপ্যায়ন থেকে দুর্ভিক্ষ- পীড়িত প্রজাপালনের মতো রাজকর্তব্যে তাঁর আর মন নেই। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার নাম করে, বস্তুত তাঁরই এই অবসাদকে কাজে লাগিয়ে শ্রুতিভূষণের মতো চতুর তার 'বৈরাগ্যবারিধি'-কে সামনে রেখে, কিছু ব্যক্তিগত সুবিধে (বিত্ত-বৈভব বাড়িয়ে নেওয়া) আদায় করে নিতে চায়। এই বিরাট বিষাদের সামনে মন্ত্রীরও কিছু করার থাকে না। ঠিক এমন সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয় কবিশেখর। ত্রাতার ভূমিকা নেয় সে। রাজাকে বোঝায়, যৌবনকে নব-রূপে ফিরে পাওয়া যায়; ভোগাসক্তির ঊর্ধ্বে উঠে নব-কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়ে। সেই কর্মযজ্ঞই যৌবনের নব-উজ্জীবন। মৃত্যুর অমোঘতার মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের স্পর্ধিত প্রত্যয়ী আত্মঘোষণা। রাজাদেশে কবি এই 'ফাল্গুনী' নাটকটি রচনা ও উপস্থাপনা করেন।

এইখানে শুরু হয় গল্পের ভেতরে গল্প। সেখানে নবযৌবনের দল খুঁজতে বেরোয় গুহার মধ্যে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা এক মান্ধাতার আমলের বুড়োকে। যে শীত, যে জরা। যে জীর্ণতায় টেনে নিয়ে আসে যৌবনকে; যে উজ্জ্বলকে করে মলিন; ভাস্বরকে করে ধূসর। সেই ভয়ঙ্করকে খুঁজতে পথে নামে নবযৌবন। যাদের প্রেরণা হয়ে থাকে সর্দার; সর্দারি সে করে না মোটেই; নিজে ছোটে না—সে শুধু আর-সকলকে ছুটিয়ে বেড়ায়। এই দলে নেতৃত্ব দেয় চন্দ্রহাস—সে ভরপুর আবেগ, আর তারই মধ্যে নিহিত থাকে প্রেমের আবেশ। দলে একমাত্র দলছুট দাদা-চরিত্রটি। বয়সে সে সবার ছোটো, কিন্তু সে অকালবৃদ্ধ। মাঝি, কোটাল আর অন্যদের সে নিজের বাস্তব-নিষ্ঠ তত্ত্বভার জর্জর কাব্য শুনিয়ে মুগ্ধ করে; শুধু নবযৌবনের দল তার ওই নিরাবেগ জ্ঞানগর্ভ কাব্যকে বড়ো ভয় পায়। আর আছে এক অন্ধ-বাউল। যে অন্ধকারে সেই বৃদ্ধকে খুঁজে বের করতে আর সকলকে পথ দেখায়। মনের আলোয় পথ চিনে সে-ই পৌঁছে দেয় চন্দ্রহাসকে গুহার ঠিকানায়। প্রেম আর প্রাণের আগুন নিয়ে চন্দ্রহাস সেই অজানা গুহার অন্ধকারে প্রবেশ করে; আর নাটকের শেষে তারই সঙ্গে আমরা সবাই আবিষ্কার করি—সেই জরা-বৃদ্ধ আর কেউ নয়, স্বয়ং সর্দার। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে যার নাম কি না আবার 'জীবনসর্দার'! ...সব শেষে এই সত্যই উন্মোচিত হয়—পিছন থেকে দেখলে যাকে বৃদ্ধ মনে হয়, মনে হয় জরা ও মৃত্যু—সামনে থেকে

দেখলে আসলে সে-ই যৌবন, যৌবনের প্রেরণা; সে-ই বারে বারে ফিরে আসা নবজীবন। নব-কর্মোদ্যমের প্রাণপুরুষ সে। চিরনবীনতার প্রতিভূ!

- এই নাটকে উল্লিখিত 'পাত্রগণ'—রাজা, মন্ত্রী, শ্রুতিভূষণ, কবিশেখর, নববসন্তের দূতগণ, শীত, নবযৌবনের দল, চন্দ্রহাস, ('উক্ত দলের প্রিয়সখা'), দাদা ('উক্ত দলের প্রবীণ যুবক'), জীবনসর্দার ('উক্ত দলের নেতা'), অন্ধ বাউল, মাঝি, কোটাল, অনাথ কলু ইত্যাদি। নাট্যকার নিজে একে 'খেয়াল-নাটক' বললেও, আলোচকের ভাষায় এ-নাটক নিঃসন্দেহে রূপক-সাংকেতিক। প্রমথনাথ বিশীর মতে—'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকগুলিকে তিন পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ। দ্বিতীয় পর্বে শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাকঘর; এবং তৃতীয় পর্বে ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ এবং কবির দীক্ষা।'[৪] ...এই নাটকগুলির মধ্যে 'ফাল্গুনী'-তে সরাসরি যৌবনধর্মের জয়গান গাওয়া হলেও, 'অচলায়তন' বা 'তাসের দেশ'-এ অন্যভাবে সেই যৌবনেরই জয়যাত্রার কথা বিধৃত। একটা অচল ব্যবস্থাকে নব-প্রাণের আঘাতে ভেঙে ফেলছে যৌবন—(স্মরণযোগ্য 'সবুজের অভিযান') দুটি নাটকেরই মূল theme তা-ই। এমনকি 'মুক্তধারা'-র অভিজিৎ, 'রক্তকরবী'-র রঞ্জন-নন্দিনী-বিশু—কোথাও সেই যৌবনধর্ম, প্রাণধর্ম আর প্রেমধর্মের তাড়নাতেই, নতুনের স্পর্ধায় প্রচলিত আর প্রথাবদ্ধ অন্যায়কে আঘাত করেছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যেমন এই যৌবনধর্মের শক্তিতে ভরপুর অমূল্য চরিত্রটি। সেদিক থেকে 'ফাল্গুনী', নাট্যকারের এই ভাবনার ভরকেন্দ্রে অবস্থিত।

'ফাল্গুনী'-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'বসন্তে ঘরছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে। ইহাদেরই বসন্তযাপনের কাহিনী কবি লিখেতেছেন।...

এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানা রকমের আছে। কারো কারো চুল পাকিয়াছে, কিন্তু সে খবরটা এখনো তাদের মনের মধ্যে পৌঁছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনো বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এই জন্য সে সবচেয়ে প্রবীণ। আশা আছে, বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ-ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।

ইহারা যাকে সর্দার বলিয়া ডাকে...লোকটা তত্ত্বকথা নহে, সত্যকারই সর্দার। এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া—পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়।....

এই কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। ...যে দলের কথা বলিয়াছি কোনো তালিকায় তাহাদের জনসংখ্যা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। ...দলের কে যে কোন্ কথাটা বলিতেছে তারও নিদর্শন রাখিলাম না। যে যেটা খুশি বলিতে পারে। কেবল উহাদের মধ্যে যারা কোনো কারণে বিশেষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে তাদেরই কথাগুলোর সঙ্গে তাদের নামের যোগ থাকিবে।' ...নাট্যকারের অভিপ্রায় ও চরিত্র-নির্মাণের প্রেক্ষিতটি এখানে স্পষ্ট।

নবযৌবনের দলের প্রেরণা সর্দার; যে জীবনসর্দারই আবার কিনা শীত-বুড়ো স্বয়ং। জরার মধ্য দিয়ে যৌবনকে চিনে নেওয়া, মৃত্যুর মধ্যে নবজীবনের ঠিকানা খুঁজে দেবার প্রেরণা সে। সেই কারণেই তার দলকে ছুটিয়ে বেড়ানো। দলের সখা চন্দ্রহাস যেন প্রেম, যে অন্ধকারের পরোয়া না-করে জীবনসত্যের অনুসন্ধানে যায়। খুঁজে পায় সেই নতুন যৌবনকে। অন্ধ বাউল, মনের অন্ধতা যার ঘুচে গেছে—সে-ই এ-দলকে দেখায় পথ। আর সব দলেই যেমন দু-একজন অকাল-প্রাজ্ঞ তত্ত্বভারাক্রান্ত থাকে, এখানে দাদা-চরিত্রটি তেমনই। বয়স যত বাড়বে ততই সে কাঁচা হয়ে উঠবে বলে আশা। এই নাটকের কবিশেখর (যে-কিনা আবার 'ফাল্গুনী'র রচয়িতাও বটে),সে-ই রবীন্দ্রনাথের এই নবযৌবন-দীক্ষার প্রধান যাজ্ঞিক। তাঁর মতের প্রধান প্রবক্তা। কবিশেখরের মন্তব্যের মধ্যেই নাটকের মূল সুরটি বেজে উঠেছে। তার মুখে আমরা শুনেছি—'মহারাজ', ঐ যৌবন ম্লান যদি হল তা হোক না। আর এক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।' ...আমরা শুনেছি—'সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সেই তো কবি-বাউলের চেলা।' ...কত অনায়াসে সে এই গভীর সত্য উচ্চারণ করে—'মহারাজ, আমাদের কথা তো বোঝবার জন্যে হয়নি, বাজবার জন্যে হয়েছে।' বলতে পারে—'পৃথিবীকে যা-কিছু সকলের বড়ো তার প্রমাণ নেই।' ...জীবন সত্যের কথা বড়ো সহজে প্রকাশ করে সে, বলে—'নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখেছেন তো? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারী করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখ-দুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক।' ...যে ডাক রবীন্দ্রনাথ শুনতে চাইছিলেন, তাঁর অন্তরাত্মার কাছে—সেই ডাক। এ-তো কবির নিজেকেই বোঝানো (Self Counselling)। তাঁর এই ভাবনারই প্রতিফলন পাওয়া যায় সমকালে রচিত একটি পত্রে।

'শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি পত্রে (শিলাইদহ, ২০ মাঘ, ১৩২২) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

...জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান; অথচ খণ্ড-খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts -এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন।...

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে,

মানবপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে।'...[৫] 'ফাল্গুনী' নাটকের মূল ভাবনা এটাই।

নাটকের 'গীতিভূমিকা'-গুলি যেমন নিয়ে আসছে প্রকৃতির নব-উজ্জীবনের বার্তা, মূল নাটকে জরাবৃদ্ধকে সর্দার রূপে খুঁজে পাওয়ায় থেকে যাচ্ছে রাজার বিষাদ-মুক্তি ও যৌবনের নবোদ্বোধন; আর এই দুই মিলে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তিগত জীবনের অবসাদ-জনিত সংকট পেরিয়ে যাবার শক্তি সঞ্চয় করছেন। সেই আশ্বাসে ভরে দিতে চাইছেন আমাদেরও। 'গীতিভূমিকা'-গুলির শীর্ষনাম একদিকে ধরিয়ে দিচ্ছে এই ভাবনার সূত্র, অন্যদিকে নাট্যদৃশ্যের সূচক-শিরোনামগুলি দিয়ে যাচ্ছে মূল বিষয়ের ইঙ্গিত; নাট্যদৃশ্যের সংক্ষিপ্ত টীকাভাষ্য যেন রচিত হচ্ছে এই নামগুলির মাধ্যমে। 'নবীনের আবির্ভাব'—'সূত্রপাত' (যুবকদলের প্রবেশ); 'প্রবীণের দ্বিধা'—'সন্ধান'; 'প্রবীণের পরাভব'—'সন্দেহ'; 'নবীনের জয়'—'প্রকাশ'। নামের সূত্র অনুসরণ করলেই নাটকের গতি ও নাট্যকারের অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে প্রতিটি দৃশ্য-সূচনায় ঘটনা সংঘটনের যে স্থান চিহ্নিত হয়েছে, তা-ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে—প্রথম দৃশ্য —'পথ', দ্বিতীয় দৃশ্য—'ঘাট', তৃতীয় দৃশ্য—'মাঠ' এবং চতুর্থ দৃশ্য—'গুহাদ্বার'। বোঝা যায়, যৌবনদলকে নাট্যকার মূল ঠিকানায় পৌঁছে দেবার আগে, পথ-ঘাট-মাঠেই ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে চেয়েছেন।

সেইখানে 'বলাকা'-র ছুটে চলা এক অন্যতর অর্থ খুঁজে পেয়েছে। 'The Cycle of Spring' ('ফাল্গুনী'-র ইংরেজি অনুবাদের নাম) তার বৃত্ত সম্পূরণের মুহূর্তে খুঁজে পেয়েছে পুনরাবৃত হবার অমোঘ মন্ত্রবাণী। রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছেন মধ্যজীবনের সংকট থেকে মুক্তির ঠিকানা। আমাদেরও ভরে দিতে চেয়েছেন নব-উজ্জীবনের আশ্বাসে। যৌবনের নবোদ্বোধন-মন্ত্রের দীক্ষায়।

কৃতঋণ :

১। "গ্রন্থপরিচয়", 'ফাল্গুনী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৭, পৃষ্ঠা-৯৯

২। প্রমথনাথ বিশী, "তত্ত্বনাট্য" ('ফাল্গুনী') 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা—২২৩-২২৪

৩। "গ্রন্থপরিচয়", 'ফাল্গুনী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৭, পৃষ্ঠা—১০৩ -১০৪।

৪। প্রমথনাথ বিশী "তত্ত্বনাট্য" ('ফাল্গুনী') 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা—১২৩-১২৪।

৫। "গ্রন্থপরিচয়", 'ফাল্গুনী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৭, পৃষ্ঠা—১০২-১০৩।